মন আমার মন

রাধাশ্যাম মন্ডল

মানুষ 'মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত'। মুক্তি কখনো বাহির থেকে আসে না ব আরোপিত হয় না। মানুষ নিজের ভিতর মনের মুক্তি ঘটিয়ে চির মুক্ত হয়ে যায়। তার আগে পর্য্যন্ত সে বদ্ধ থাকে। যেমন একটি গোটা পিঁয়াজ - যখ সে আস্ত থাকে তখন তার 'বদ্ধ' অবস্থা। আবার পিঁয়াজের এক একটি খোস ছাড়াতে ছাড়াতে এমন একটা অবস্থায় আসে যখন পিঁয়াজের আর অস্তিত্ব থাকে না। এটি হল 'মুক্ত' অবস্থা। মনের বেলাও তাই। এক একটি স্তর অতিক্র করতে করতে মন এগুতে থাকে। শেষে মনের লয় প্রাপ্ত হয়। মন একটি জ পদার্থ। যার লয় আছে তা জড় বস্তু। আর যা অপার্থিব তা চিরন্তন শাশ্বত এর শুরুও নেই শেষও নেই। এ ছিল, আছে ও থাকবে। ইহাই 'পরমাত্মা' শক্তি মনও লয়, প্রাপ্ত হয়ে অস্তীত্ব হারিয়ে এই পরমাত্মারূপ 'সৎ' শক্তিতে বিলী হয়ে যায়। যে পরমাত্মারূপ 'সৎ' শক্তি প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে সেই স শক্তিতে মন লয় প্রাপ্ত হয়। মনের এই রূপ অবস্থা লাভের কথা ভাবতে য সোজা কার্যে তা আদৌ সহজ নয়। এই অবস্থায় আসতে কত সাধক জন্ম জন্মা অতিক্রম করে শেষে কয়েক কোটিতে দু'একজন উতরে যায়। মনের জ অবস্থার মুক্তি ঘটিয়ে মানুষ চিন্ময় সত্তায় উপণীত হয়। তখন এর নাম কে বলেন 'মোক্ষ', কেউ বলেন 'নির্বাণ' বা কেউ বলেন 'মুক্তি'। তার আগে পর্য মন পিঁয়াজের খোসার মত মাত্র একটি স্তরেই আবদ্ধ হয়ে কয়েক জন্ম ধ ঘুরপাক খেতে থাকে। এর মধ্যে তার ভাবনা চিন্তা ক্রিয়া কর্ম সব। যেমন ম একটি স্তরে ক্ষুদ্র স্বার্থ, অহংবোধ, নীচতা, চৌর্য্য-বৃত্তি, পরশ্রী কাতরতা ইত 'তম' গুণগুলি প্রকট হয়ে থাকে। এই একটি মাত্র অহং বৃত্তেই ঘুরপাক খে খেতে কত জন্ম কেটে যায় একজন মানুষের। এই বৃত্তের বাহিরে সে অ কিছু ভাবতে পারে না। এই স্তরে পশুর যাবতীয় গুণাবলি তার মধ্যে প্রকা হয়ে থাকে। তার সঙ্গে মনুষ্যচিত অল্প স্বল্প কিছু ভাল গুণও থাকে। একটু ভাবে চিন্‌তা করলে বোঝা যায় এই সব মানুষগুলি সদ্য সদ্য দু'এক জন্ম আ

মাত্র পশু যোণী থেকে মনুষ্য যোণীতে জন্ম গ্রহন করেছে। এখনো সেই পশুবৃত্তির সংস্কারগুলি মনে রয়ে গেছে। এই অবস্থা মনের অন্ধকারময় অবস্থা। বদ্ধ অবস্থা। আমরা বলি তিন গুণের মানুষ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। প্রথমে তমঃ। পরে রজঃ ও তারপর সত্ত্বে যায় মানুষ। এক লাফে এই গুণগুলি অতিক্রম করতে পারে না কেউই। মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিগুলি একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে উন্মোচন করতে করতে মানুষ এগুতে থাকে। এই ভাবে মনের ক্রমঃ বিকাশ ঘটে। বা অন্যভাবে বলা যায় মন জাগতিক কর্মকান্ডের ভিতর দিয়ে শিক্ষা গ্রহন করে ক্রমে, ক্রমে পরিশীলিত হতে থাকে। গ্রন্থি শব্দের অর্থ গিট। যেমন একতাল সূতোর জট খুলতে গিয়ে আমরা আনাড়ির মত এদিক ওদিক টানাটানি করে সূতোর মধ্যে অসংখ্য গিট দিয়ে ফেলি, তেমনি অজ্ঞানতার জন্য অসংখ্য গ্রন্থি সৃষ্টি করি আমরা নিজেদের মনে। আবার এক একটি গ্রন্থি উন্মোচন করতে করতে ক্রমান্বয়ে রজঃ ও সত্ত্ব গুণের দিকে এগুতে থাকি। কিন্তু আমরা যে ভুলের গ্রন্থিগুলি সৃষ্টি করি এর জন্য দায়ী কে? দায়ী আর কেউ নয়। দায়ী আমাদের এই 'মন'। মনের প্রকৃতি এতই চঞ্চল যে আমাদের স্থির থাকতে দেয় না। এখুনি এক চিন্তা তো পরক্ষণে আর এক চিন্তা। সব সময় তার স্বার্থ বুদ্ধি। আমি এই মানুষটা, তিনটি জিনিষের সমন্বয়ে গঠিত। 'দেহ', 'মন' ও 'আত্মা'। মন এই আমি রূপ দেহ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে সর্বদা শাসন করতে চায়। সে কিছুতেই 'আত্মা' শক্তিকে প্রকাশ হতে দিতে চায় না। কারণ 'আত্মা' হল 'ব্রহ্ম' শক্তি বা আলো। এই আলো এসে দেহের অন্ধকারময় গুহায় পড়লেই মনের মৃত্যু হবে। তাই মন কিছুতেই আত্মাকে উদ্ভাসিত হতে দিতে চায় না। তাই সে নিজের চঞ্চলতা বাড়িয়ে দিয়ে এই দেহের শাখা প্রশাখাকে অস্থির করে তোলে। কারণ দেহের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। সে মনের দাসত্ব করে মাত্র। মন দেহকে ইচ্ছে মত ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। তাই তো বাউল সাধক গান বেঁধেছেন - " ও মন পাগলা ঘোড়ারে, কোথা থেকে কে লইয়া যাও"। এই অবস্থায় 'আত্মা' থাকে নিরপেক্ষ। তার কোন দায় নেই আমার এই দেহরূপ গুহায় আলো ফেলার। সে শুধু বলছে — হে মন, তুমি শান্ত হও। যতক্ষণ তুমি ক্রিয়াশীল ও চঞ্চল থাকবে ততক্ষন তুমিও কষ্ট পাবে, সংগে দেহটাকেও কষ্ট দিবে। তুমি শান্ত হলেই কেবল মাত্র তোমাকে সুপথের সন্ধান দিতে পারি।

তোমার কষ্টের লাঘব করতে পারি। 'আত্মা'র এই ডাক 'কু-মন' শুনতে পা
না কখনো কখনো 'সু-মন' শুনতে পায় এবং এই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি
পাবার পথ খুঁজতে থাকে। 'কু'-মনের প্রভাব এত বেশী থাকে যে তাকে বশে
আনা দুর্বল 'সু'মনের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই চঞ্চল অবাধ্য মনকে শান্ত প্রকৃতিস্থ
করার জন্য 'সু' মন বিভিন্ন যোগ ক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ধ্যান, যোগ, তন্ত্র
এ সব আর কিছু নয় — অবাধ্য মনকে বশ করার পন্থা মাত্র। কারণ মন একাগ্র
হয়ে যখনই আত্মার আহ্বান করবে 'আত্মা' তখন উদ্ভাসিত হবে তার অপার
মহিমায়। 'আত্মা' প্রকট হলে মুহুর্ত্তে মানুষরূপী পশু হয়ে যাবে দেবতা। সত্ত্বগু
গুলির সমন্বয় ঘটবে তার মধ্যে। কারণ দেবতাই একমাত্র সত্ত্বগুণের অধিকারী
তবে এই সত্ত্বযুক্ত গুণান্বিত অবস্থায় মানুষ দেবতা হতে পারে কিন্তু তার মুক্তি
বা মোক্ষ লাভ হবে না। কারণ এই অবস্থায়ও মনের বিলোপ ঘটে না। সূক্ষ্ম
আকারে মন রূপ 'আমি' তখনো থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে ঐ দেব স্বরূপ মানুষটির
পুনরায় জন্ম গ্রহনের সম্ভাবনা থাকে ষোলো আনা। জন্মালেই তো আবার সে
জ্বরা, ব্যাধী, মৃত্যুর দাসত্ব আর কর্ম বন্ধন। একমাত্র ত্রিগুণাতীত অবস্থায় মনে
সম্পূর্ণ বিনাশ হয়, যা আমাদের যোগীদের সৃষ্ট একমাত্র নির্বিকল্প সমাধি
অবস্থাতেই তা সম্ভব। তখনই মনের লয় হয়। তখনই জীবাত্মা পরমাত্মায় সম্পূ
রূপে লীন হয়ে যায়। আর জন্ম হয় না। আবার এই নির্বিকল্প সমাধি অব
থেকেও শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজের মত কিছু কিছু অবতার পুরুষ শোক তা
যন্ত্রণাক্লীষ্ট মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য দেহটাকে রেখে দেন নি
কিছু সময়ের জন্য। আবার নির্দ্ধারিত কর্ম সমাপ্ত হলে এই জড় দেহও চি
সত্বায় বিলীন হয়ে যায়। এই চিন্ময় সত্বা কি? — এ হল 'ব্রহ্ম' সত্বা।
ব্রহ্ম সত্বা কেমন? তার কি রূপ তা কোন সাধকের পক্ষেও বলা সম্ভব না
কারণ সাধকের যখন 'ব্রহ্ম' সাক্ষাত হয় তখন ত তার মনের সম্পূর্ণ লয় ঘটে
ব্রহ্ম স্বরূপকে পরিমাপ করার মত মন নামক ফিতে তার থাকে না। তাই সাধ
ব্রহ্মের চিন্ময়রূপ বর্ণনা করতে পারে না। তাই ত রামকৃষ্ণ বলেছেন — 'ব্র
এঁঠো হয় না'।

মনের নাশ হলে — 'কর্মনাশ' হয়। 'কর্মনাশ' হলে পুনঃজন্ম রহিত হ
কারণ কর্মের সংগে জন্মের সম্বন্ধ। কর্ম থাকলে তার ফল থাকবে। আর

ফল ভোগ করার জন্য পুনরায় জন্মাতে হবে। তার মানে 'কর্ম ও জন্ম' চক্রব্যূহের মাঝে পড়ে জন্ম জন্ম ঘুরপাক খেতে হবে। মনের নাশ হলে 'আমিত্বে'র নাশ হবে। আশা আকাঙ্খার নাশ হবে — উঁচু নীচু, ভাল মন্দ, জ্ঞান অজ্ঞান সব কিছুর নাশ হবে। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন সবই যদি নাশ হবে তবে ত মানুষ একটি মূল্যহীন জড় ভরতে রূপান্তরিত হবে। আসলে কিন্তু তা নয়। মানুষ তখন পাকা আমিতে বসবে। বোধীসত্ত্বের মধ্যে সে বাস করবে। যতদিন সে বেঁচে থাকবে সাক্ষী স্বরূপ হয়ে বাস করবে। দৃঢ় সত্যে সুদৃঢ় জ্ঞানে ও নিরবচ্ছিন্ন রসাস্বাদনে পরিপুর্ণ হয়ে "সচ্চিদানন্দ' স্বরূপে নিয়ত অবস্থান করবে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায়-শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন — 'এই অবস্থায় তাপস আমার গুণে-গুণান্বিত হয়। তাতে আর আমাতে আর প্রভেদ থাকে না'। এই অবস্থার নাম 'সিদ্ধি' — যা মানুষের চির আকাঙ্খিত ধন। এরই জন্য বুদ্ধদেব রাজ ঐশ্বর্য্য ছেড়েছেন, চৈতন্য দেব সংসার ত্যাগী হয়েছেন। কেউ কেউ আবার শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজের মত বা জনক ঋষির মত সংসারের মধ্যে থেকেও সর্ব্বত্যাগীর মত অতিবাহিত করেছেন নিজেদের জীবনকে।